Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৬৯তম অন্তর্জাল সংখ্যা

৮ই পৌষ, ১৪৩২ / 24.12.2025

-: সম্পাদক :-

সুনন্দন ঘোষ

-: সূচীপত্র :-

(৬৯তম অন্তর্জাল সংখ্যা)

প্রীতি কণা	শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ
আত্মকথা	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
প্রজ্ঞাবান সাধকের লক্ষণ	স্বামী বিদ্যানন্দ গিরি
শ্রীঅরবিন্দ ও ভারতে জাতীয়তাবাদ	শ্রী রামেশ্বর শ’
কোহিমায় ক’ জনায়	শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য
মাতৃপূজা	শ্রী শান্তশীল দাস
প্রয়োজন নেই	শ্রীমতী বাণীপ্রভা মালব্য
ফিরে চাওয়া	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

Founded by Sri Priti Kumar Ghosh in June, 1960, PARTHASARATHI Bengali Monthly Magazine, RNI 5158/ 60, published in print format for sixty years, thereafter converted to e-magazine by Sri Sunandan Ghosh, Editor & Publisher in April, 2020 during prolonged Nationwide Lockdown and to be published in the Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D/1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 8910977590.

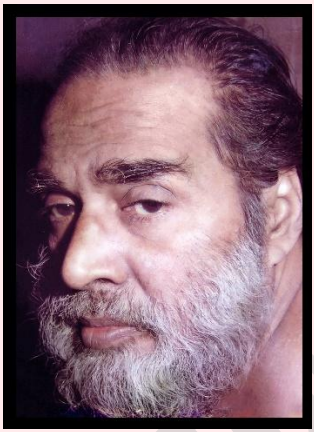

(১০ই মার্চ, ১৯২৬ – ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৬)

- প্রীতি কণা –

"অহং ভাব সকল বন্ধনের মূল। স্বার্থের বশে কর্ম না করে কোনরূপ অহংচিন্তা না রেখে ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম করলে আমরা এই বন্ধন ছিন্ন করে মুক্ত হতে পারি।"

পার্থসারথি আরেকটি বছর পূর্ণ করলো। আষাঢ় মাস তার জন্মমাস। সাড়ে ছ' বছর পত্রিকাটিকে টেনে নিয়ে এলাম। এটুকু যে পারবো সেটাই আমার হিসেবের বাইরে ছিল। দেখলাম সেই চিরাচরিত কথাটাই সত্য – "সাধনা থাকিলে হইবে সিদ্ধি বিধি মিলাইবে পুরস্কার।" – পুরস্কার কি পেয়েছি জানিনা, তবে ইচ্ছে পূরণ হলে তার জন্য প্রশান্তি লাভের ব্যাপারটা তো আছেই।

মনে হচ্ছে এই তো সেদিন! সেই ভদ্রলোক দুপুরে বাড়ীতে থাকলে পা টিপে টিপে এসে কানের কাছে মুখ রেখে খুব আস্তে বলতেন – "কি ব্যাপার? খুব ঘুমোচ্ছ? চা হবে না?" বেশীরভাগ সময় নিজেই চা করে পাশটিতে এসে বসতেন। একা চা খাওয়াটা তাঁর খুব পছন্দ ছিলো না। আমি বিয়ের আগে চা খেতাম না। চা ধরেছি বিয়ের পর। ১৯৯২ সালের মে মাস পর্যন্ত চা খেয়েছি। হঠাৎ একেবারেই চা ছেড়ে দিলাম। এখন কেউ অনুরোধ করলেও একফোঁটা চা আমি মুখে দিই না। অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশনের জন্য আর.জি.কর. হাসপাতালে প্রায় ১৫ দিন ছিলাম। ওখানে চা খেতে ইচ্ছে হয়নি। বাড়ী এসে আর খাইনি। মাঝে ক'দিন খুব অসুবিধে হত। সোমা যখন চা করতো এক গ্লাস গরম জল দিত। বাপী একদিন বললো গরম জল খেলে সেই নেশাই তো হয়ে যাচ্ছে। ভেবে দেখলাম সত্যি। ওটুকুই বা ছাড়তে পারবো না কেন? দীর্ঘ ৩৬ বছরের নেশা ছেড়ে দিলাম। এরকম নেশা শ্রীপ্রীতিকুমারও ছেড়েছিলাম।

১৯৫০-৫২ সাল থেকেই দেখেছি তাঁকে খুব সিগারেট খেতে। যে সে সিগারেট নয়। গোল্ড ফ্লেক নয়ত ক্যাপস্টান। প্রতিদিন কম করে পাঁচ প্যাকেট। সেই ক্যাপস্টান- এর টিন আমার কাছে এখনও দু' তিনটি রাখা আছে। এক একটি বাজেট পেশের আগে দেখতাম সিগারেটের টিন টেবিলের উপর ডাঁই করা থাকত। যদি আর না পাওয়া যায়! আমার কিন্তু সেই অল্প বয়সে ঐ সিগারেটের গন্ধ বেশ ভালোই লাগতো। এখন সিগারেটের গন্ধ একেবারেই সহ্য করতে পারিনা। আর রাগ হত যখন দেখতাম চায়ের কাপে সিগারেট খেয়ে অবশিষ্টাংশ ফেলতেন। আমি

খুব চেঁচামেচি করতাম। সেই শ্রীপ্রীতিকুমারকে দেখলাম ১৯৮৩ সালে সিগারেট ছেড়ে দিতে। আমার বড় নাতনী জুনকো কথা বলতে শেখেনি তখনও, কি ভাবে যেন তার হাতে সিগারেটের ছ্যাঁকা লেগে যায়। দাদু কি অনুতপ্ত হয়েছিলেন তা বলবার নয়। তাঁর নেশার জন্য ঐটুকু শিশুর আঘাত লাগলো এটা তিনি মেনে নিতে পারেন নি। সেই দিন থেকেই সিগারেট বন্ধ। প্রথম প্রথম দেখেছি কি ছটফট করেছেন, রাত্রে ঘুমাচ্ছেন না। তারপর সব ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু চা আর ছাড়তে হয় নি। দিনে ১৫-২০ কাপে এসে ঠেকেছিলো। সারাদিন – কখনও দিনের পর দিন কোন খাবার খেতেন না। কখনও তাঁকে ক্লান্ত দেখিনি। আমিও রাগ হলে দিনের পর দিন ভাত খেতাম না। কিন্তু এখন ভাত না পেলে মনে হয় মাথা ঘুরছে। বিশেষ করে ষষ্ঠী বা কোনও পূজা দেবার দিনে আমার যেন বেশী করে ভাত-ক্ষিদে পেয়ে যায়। ওটাও কবে ছেড়ে দেবো। আগে কোনও বিশেষ পূজা দেবার সময়ে খেয়েই পূজা দিতাম। আমি খুব খুঁতখুঁতে। মনে হত পূজা ঠিকমত দেওয়া হল না। এখন আর কোনও চিন্তা হয় না। এখন অনেক বেলা হলেও বিনা চায়ে কোথাও পূজা দিতে অসুবিধা হয় না। মানুষ অভ্যাসের দাস। সে অভ্যাস ছাড়তে শুধু একটু মনের জোর লাগে।

এবার আসি নিজের কথায়। গরমের ছুটি এবার আমার বাড়ী বসেই কাটলো। দীর্ঘদিন কোথাও যাওয়া হয় না। সেই পূজার সময় লক্ষ্ণৌ গিয়েছিলাম। দুদিন গোছগাছ করা সত্ত্বেও ঘুম না ভাঙ্গবার জন্য তারাপীঠে যাওয়া হয়নি। দমদম থেকে শিয়ালদহ গিয়ে সওয়া ছ'টায় কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস আর ধরা হয়নি। পরপর দু'দিন fail করেছি। এবার ভাবছি একবার ঘুরে আসি।

মাঝে একটি অন্যায় করেছি। কস্তুরীর (কিশোরের মেয়ে) সাথে আমার মনোমালিন্য হয়ে গেছে। আমার হাতের গাঁট্টা খেয়ে সে আমার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করেছে। আমিই বা কেন তাকে vacation-এর task-গুলি করাতে গেছিলাম ভাবলে এখন অনুতাপ হয়। আমার কি দরকার ছিল তাকে পড়াশুনো করানোর? এবার ঠিক করেছি আর কোনও বাচ্চার পড়াশোনার দিকে নজর দেবো না। বাচেন্দ্রীরও যদি

কস্তুরীর মত গাঁট্টা খেলে গোঁসা হয়, আগের থেকে সতর্ক থাকাই ভালো। তবে বাচেন্দ্রীর চারিত্রিক লক্ষণ যা ফুটে উঠছে, তাতে তিনি বসে বসে মার খাবেন বলে মনে হয় না। আমাদের বাড়ীতে এরকম মেয়েই দরকার। আমার মতো বেহিসাবী হলেই মুস্কিল। আমি তো শ্রীপ্রীতিকুমারের সাথে ঘর করে পরহিতার্থে অনেক সময় ব্যয় করেছি। এ বাড়ীতে খাল কেটে যত কুমীর আমিই ঢুকিয়েছি এবং তার জেরও আমিই টানছি। আমার শেষ জীবনের শিক্ষা এখনও বাকী আছে।

এবার শেষ কথায় আসি। এই মাসে গ্রাহকদের দেওয়া চাঁদার মেয়াদ শেষ হল। আগামী মাসের সংখ্যা প্রকাশের আগে দয়া করে ২৫ টাকা M.O. করে দেবেন। যারা কাছে থাকেন তারা টাকাটা বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবেন। গতবার সকলেই এ'বিষয়ে সহায়তা করেছিলেন। আমি আশা করবো এ' বছরও গ্রাহকদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা পাব।

পার্থসারথি তার ৩৩ বছর বয়স পূর্ণ করল, এবার ৩৪ বছরে পদার্পণ করবে। আমরাই কি ভেবেছিলাম এর প্রকাশনা চালু রাখতে পারবো? কারণ পত্রিকাটি বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভরশীল নয়। শ্রীপ্রীতিকুমার থাকতে বিজ্ঞাপন দেবার একটা প্রচেষ্টা ছিল। যাঁরা বিজ্ঞাপন যোগাড় করে দিতেন তাঁরা অন্ততঃ "কেমন আছেন? দরকার হলে ডাকবেন..." – বলে সম্পর্কটুকু বজায় রেখেছেন। আমি তাতেই ধন্য। কারণ কখন কি সমস্যা আসে তাতো বলা যায়না। এঁরাই আমার প্রধান বলভরসা। একজন শুভানুধ্যায়ী একদম সময় হলেই বার্ষিক হিসাবে টাকা পাঠিয়ে দেন। কিন্তু আমার সারামাস চলে কি ভাবে? এপ্রিল-এর salary তো এখনও পাই নি। তবে আমার প্রেসের মালিকেরা খুব সদয়। কখনও কোনও ভাবে টাকার তাগাদা দেন না। শ্রীপ্রীতিকুমারের এ'টুকু কৃপা না থাকলে আমি কোথায় তলিয়ে যেতাম!

পার্থসারথি নিয়ে যাকে ভাবনা চিন্তা করতে বলতাম ভগবান তাকে অসুস্থ করে রেখেছেন। তবু একটি কথা স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই – আমার তীর্থযাত্রায় তার যে অবদান, সেটাই আমার পক্ষে অনেকখানি। আজ তারাপীঠ যাবো, কাল

পশুপতিনাথ যাবো, পরশু উজ্জয়িনী যাবো, সে ঠিক আমাকে সাধ্যমতো হাতখরচ যোগান দেয়। আমার চোখে জল এসে যায়। আমি চাই না, আশা করি না, কিন্তু সে করবেই। আমার ঋণের বোঝা বেড়ে যায়। না নিলে সে কষ্ট পাবে। আমি কোনও ভাবেই তাকে কষ্ট দিতে চাই না। একটি প্রার্থনাই করি – ভগবান তাকে আনন্দে রাখুন, সুস্থ রাখুন।

আমি আজকাল আর গঙ্গাস্নান করি না। দেখ না দেখ কোনও মন্দিরে যাই না। Pollution-এর ভয়ে গঙ্গাস্নান বন্ধ করেছি। সময়াভাবে মন্দির দর্শন বন্ধ আছে। শ্রীমতী বাচেন্দ্রীর জন্য এখন আমি অনেকটা সময় দিয়ে ফেলি। যতই বলি না কেন আসক্তি বাড়াব না, ও আসক্তি স্বভাবগত, সংস্কারগত। স্নেহ নিম্নগামী। তাই এখন আর বেশী কাজ মনে হয় না। মনে হয় বাচেন্দ্রীর সব কাজগুলিও যদি করি, তাতেই আমার আনন্দ। গত দু' সপ্তাহ প্রায় তিনি আমার কাছেই ঘুমাচ্ছেন। আমার বুকের মধ্যে ভরে ওঠে। কখনও দেখতে ইচ্ছে করে সেই ১৯৮৩ সাল থেকে যে মুখটি প্রাণের মধ্যে খোদাই করা আছে আজ এই ১৯৯৩ সালে সেই মুখের অধীশ্বরী কেমন দেখতে হল, কত বড় হল!

আশা নিয়ে বসে আছি। শ্রীপ্রীতিকুমার আমার জন্য আরও কি পাওনা তুলে রেখেছেন দেখবার জন্য।

- - - - - - - - -

(** রচনাকাল – মে, ১৯৯৩)

" শিল্পে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করতে হবে, নইলে অস্বাস্থ্য ও অন্নাভাবে অচিরে বাঙালী জাতির অর্দ্ধেক ধ্বংস হয়ে যাবে।"

- প্রমথ চৌধুরী (বীরবল)

পরমাত্মা জীবদেহে প্রাণের প্রাণরূপে আছেন ওতপ্রোত ভাবে। অজ্ঞানতা-বশতঃ জীবাত্মা তাঁর অবস্থান জানতে পারে না। যোগ সাধনের কৌশল অবলম্বনে সাধক আপন বোধে পরমাত্মার পরিচয় পেয়ে তাঁর সঙ্গে হন একাকার। সাধকের আচার আচরণে তাঁর অন্তর বাহিরের পরিচয় পাওয়া যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন-

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে।। গীঃ - ২/৫৫
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।। ২/৫৬
যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।। ২/৫৭
যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিত্তঃ।
ইন্দ্রিয়ানি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ।। ২/৬০
তানি সর্বানি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়ানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।। ২/৬১

সরলার্থ – পরমাত্মাতে সমাহিত সাধক কিরূপে পার্থিব জীবনে আচার আচরণ করেন, এ প্রশ্ন করেছিলেন অর্জুন। তদুত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়ে দিচ্ছেন – আপন আত্মার জ্ঞান হলে সাধকের অন্তরে জাগতিক কামনা বাসনা বিষয়ানুরাগ থাকে না। তিনি সর্বারম্ভ পরিত্যাগী হয়ে বাস করেন। তাঁর কাম্য কর্মের প্রবৃত্তি হয় নির্মূল, কর্মফলের আশা আকাঙ্ক্ষা মুক্ত সাধক নিজচেতনায় আপনভাবে করেন অবস্থান। পরম সন্তোষে করেন বাস। এমন কি আহার বিহারের চেষ্টাও মনে স্থান পায় না। সর্ববিষয়ে থাকেন নিশ্চেষ্ট, যদৃচ্ছা লাভে সন্তুষ্ট। এই পর্য্যায়ের মহাত্মাই আত্মজ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান, ঈশ্বরবোধে স্থিতিশীল। এই প্রজ্ঞাবান মহাত্মাগণ দুঃখে, দারিদ্র্যে, বিপদাপদে অশেষ ক্লেশ উপস্থিত হলেও থাকেন নিরুদ্বেগ, নির্বিকার। অশেষ সুখ সম্পদের মধ্যেও উল্লাসের কোনও উত্তেজনা দেখা দেয় না মনে। কোন

কিছুতে বিশেষ আকর্ষণ, কোন কিছুর ভয় ভীতি ক্রোধের উন্মাদনা দেখা যায় না তাদের আচরণে। এসকল মহাত্মা সর্বদা ধীর স্থির ও জ্ঞানের আলোকে উদ্দীপ্ত হয়ে যাপন করেন নির্বিকার জীবন। এ সকল মহান সাধকগণ পরিবার পরিজন, স্বজনবন্ধুর স্নেহ মমতা থেকেও মুক্ত। সন্তানাদির শুভাশুভ বিষয়েও অনাসক্ত। মঙ্গল লাভে নাই সুখের তরঙ্গ, অমঙ্গলে নাই বিষাদের কালো ছায়া, সমদৃষ্টিতেই স্থিতি করেন মহাত্মাগণ। এঁরাই যথার্থ ঈশ্বরজ্ঞানী, স্থিতপ্রজ্ঞ। সর্বাবস্থায় সর্বত্র ঈশ্বর বোধ করে অবস্থান করেন মহাত্মাগণ।

এরূপ জ্ঞানে সমাহিত হওয়া সহজ কথা নয়। স্থির বুদ্ধি কঠোর ব্রতী সাধকগণও ভয়ানক চঞ্চল ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা অস্থির হয়ে পড়েন। লোভ, কাম ক্রোধ, হিংসায় উন্মত্ত ইন্দ্রিয়গুলি সাধনায় পারদর্শী সাধকগণকেও বিচলিত করে; মোহিনী মায়াতে আবদ্ধ করে বিষয়ের দিকে করে আকর্ষণ। ইন্দ্রিয়গুলির দৌরাত্ম্য প্রতিরোধ করা সর্বাপেক্ষা কঠিন সাধন। অবিরাম ঈশ্বর স্মরণ-মনন জপ-ধ্যান তপস্যা করলে ইন্দ্রিয়গুলি হয় শান্ত। সর্বক্ষণ ঈশ্বর স্মরণ, স্বল্পাহার, আত্মভাবে অবস্থান ইন্দ্রিয় দমনের মহৌষধ। আত্মায় চিত্ত স্থির হলে ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত হয়। অন্তরে ঈশ্বর জ্ঞানের আলোর প্রকাশ হয়ে থাকে, মন বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করে আত্মায় করে স্থিতিলাভ। আত্মস্থিতিই জ্ঞানের পরিচয়। নিরুদ্বেগ, নিশ্চেষ্ট, মুক্তজীবন ইহজীবনের সুখ শান্তি পরকালের নির্বাণ।

মন্তব্য – আত্মজ্ঞান পরমাত্মায় স্থিতি, ব্রহ্মানুভূতি, অধ্যাত্ম জীবনের সার্থক পরিণতি। জীবনে মানুষ কামনা করে ধনৈশ্বর্য্য, সুখ-সম্পদ। কিন্তু সকলের জানা উচিত অধ্যাত্ম পথ অনুসরণ না করলে কেবল ধন মান বিদ্যা বুদ্ধি জীবনে দুঃখের আর্তনাদ নিবারণ করতে পারেনা। ধনী হও, দরিদ্র হও, সকলকেই অধ্যাত্ম বিদ্যা অর্জন করে ইহজীবনকে করতে হবে সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও সুখকর। অধ্যাত্মবিদ্যা আত্মজ্ঞান লাভের শিক্ষা। আত্মজ্ঞান মানুষের যথার্থ পরিচয়। জীবে জীবে ঈশ্বর, তিনিই সকলের জীবন। তিনি আমারও জীবন, প্রাণের প্রাণ আত্মা। তা হলে 'আমি' 'আমি' বলতে যাকে বুঝায় সেই আমিই তিনি। তাঁরই সত্তা আমাতে তোমাতে

সকলের মধ্যে প্রাণপুরুষ রূপে বিদ্যমান। এই জ্ঞানই আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞানই মুক্ত পুরুষের জীবন। আত্মজ্ঞান লাভেই মানুষ হয় ধীর স্থির, সুখী শান্ত, নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ত। মহাদুঃখেও বিচলিত হয় না; মহাসুখেও দম্ভ অহঙ্কারে উল্লাসে উন্মাদ হয় না। ইহাই মনুষ্য জীবনের সার্থক পরিণতি ।

কণ্ঠস্থ – শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।। ৪/৩৯

জ্ঞানলাভের উপায় শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও সংযম। ঐকান্তিক আগ্রহ, একান্ত মনোযোগ ও কঠোর তপস্যা – এভাবে সাধন সহায়ে জ্ঞানার্জন করে মহাপুরুষগণ হয়েছেন শান্ত সমাহিত জীবনের অধিকারী।

শ্রীঅরবিন্দ ও ভারতে জাতীয়তাবাদ — শ্রী রামেশ্বর শ'

বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছিলেন জাতীয়তার মন্ত্র – বন্দেমাতরম! শ্রীঅরবিন্দ করেছিলেন জাতীয়তার মন্ত্রে শক্তি সঞ্চার। বঙ্কিমচন্দ্র যদি হন দেশমন্ত্রের দীক্ষাগুরু, তবে শ্রীঅরবিন্দ হলেন দেশমন্ত্রের শিক্ষাগুরু। যে মন্ত্র কবি বঙ্কিমের ধ্যানে ধরা পড়েছিল, যার বাণীমূর্তি রচনা করেছিলেন 'আনন্দমঠে', সেই মন্ত্র জীবন্ত হয়ে উঠল শ্রীঅরবিন্দের অগ্নিতপস্যায়, সক্রিয় হয়ে উঠল 'ভবানী মন্দির'-এর পরিকল্পনায়। মন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে সাধকেরই প্রাণপ্রতিষ্ঠায়। শ্রীঅরবিন্দই জাতীয়তার মন্ত্রে সেই প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রমিথিউসের মতো যে অগ্নি তিনি স্বর্গ থেকে এনেছিলেন সমগ্র মানব নিয়তিকে আলোকিত করার জন্য, তারই যেন পুণ্যস্পর্শ পেয়ে বন্দেমাতরম্ মন্ত্র স্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে – সূচিত হল বাঙলায় অগ্নিযুগ। আর বাংলার সেই হোমাগ্নির শিখা থেকে মশাল জ্বেলে ভারতের অন্য প্রদেশের নেতারাও আগুন ছড়িয়ে দিলেন দেশের কোণে কোণে। জাতীয়তার

এই অগ্নিগর্ভ রূপের আদি আচার্য্য শ্রীঅরবিন্দের সুমহান অবদান তাঁর সমসাময়িক নেতৃবৃন্দের অনেকেই উপলব্ধি করেছিলেন এবং শ্রীঅরবিন্দের প্রতি জানিয়েছিলেন তাঁদের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি।

মানিকতলা বোমার মামলায় শ্রীঅরবিন্দের সমর্থনে দেশবন্ধু যা বলেছিলেন তাতে ছিল জাতীয়তার জাগরণে শ্রীঅরবিন্দের এই সক্রিয় সাধনার প্রতিই অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন –

"Long after this controversy is hushed in silence, long after this turmoil, this agitation ceases, long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of Nationalism...."

পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপত রায় কলকাতায় ১৯২০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের সভাপতি রূপে ভাষণ দিয়ে উল্লেখ করেছিলেন বাংলার পুরুষ শ্রীঅরবিন্দের কাছে ভারতের এই ঋণের কথা –

"It was at Calcutta that the ideas of new Nationalism that has since then grown into a mighty tree, were first expounded and explained by one of the purest minded and the most intellectual of Bengal's gifted sons. I mean Sri Arabindo Ghosh ...." (Indian Annual Register, 1921, pt.III, P.2)।

এ প্রসঙ্গে সবার উপরে মনে পড়ে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রথম মন্ত্রোদ্গাতা অর্থাৎ চরম জাতীয়তার আদি হোতা, শ্রীঅরবিন্দের প্রতি মহাকবির অর্ঘ্য নিবেদন –

"সেই বিধাতার
শ্রেষ্ঠ দান আপনার পূর্ণ অধিকার
চেয়েছ দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায়

সত্যের গৌরবদীপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়
অখণ্ড বিশ্বাসে।”

কিন্তু জাতীয়তার জাগরণে শ্রীঅরবিন্দের অবদানের স্বীকৃতির তালিকা আর দীর্ঘ করে লাভ নেই। এর মধ্যে লক্ষণীয় শুধু এই কথাটুকু যে সমগ্র মানব জাতির বিবর্তনে শ্রীঅরবিন্দ যেমন এনে দিয়েছেন অভিনব এক সম্ভাবনার অব্যর্থ পথনির্দেশ তেমনি শুধু ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের বিবর্তনেও এনে দিয়েছিলেন এমন এক চেতনা – এমন এক প্রয়াস – যা ভারতের ইতিহাসে রচনা করেছে অভিনব এক অধ্যায়।

কিন্তু কোথায় তার অভিনবত্ব, কেন তার অভিনবত্ব, সে কথা বোঝার জন্য অনেক কিছুই তলিয়ে দেখা দরকার। বিশ শতকের গোড়ায় শ্রীঅরবিন্দ যা এনে দিলেন জাতীয় জীবনে এবং জাতীয় চেতনায় তা প্রাচীন বা মধ্যযুগের ভারতবর্ষে ছিল না, এমন কি প্রাক্- শ্রীঅরবিন্দ আধুনিক ভারতেও পাই না। এক অর্থে অবশ্য কোনও অভিনব প্রচেষ্টাই সম্পূর্ণ অভিনব বা পুরোপুরি ভুঁইফোড় কিছু নয়। ইতিহাসের বিবর্তনে তার জন্য পূর্ব থেকেই চলে ক্ষেত্র-নির্মিতির সাধনা, তার পূর্বাভাস ও পূর্ব প্রস্তুতি। এই অর্থে শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তাবাদেরও একটি পূর্ব ইতিহাস অবশ্যই আছে। কিন্তু তাঁর পূর্ববর্তী প্রস্তুতি-পর্বের সঙ্গে তুলনায় তাঁর হাতে গড়া জাগৃতিপর্বের অভিনবত্ব ও উচ্চতা এতই বেশি যে শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তাবাদের মৌলিকত্ব ও অভিনবত্ব আমাদের স্বীকার করতেই হয়। বঙ্কিম-পূর্ব বাংলা সাহিত্যের তুলনায় বঙ্কিমের সৃষ্টির বিরাটত্ব ও অভিনবত্ব বোঝাতে গিতে রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছিলেন, সে কথা কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে প্রয়োগ করতে পারি – দার্জিলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরমালা যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন সেই অভ্রভেদী শৈলসম্রাটের চূড়াটি তার চারিপাশের অন্যান্য শিখরমালার তুলনায় কত ঊর্দ্ধে সমুত্থিত। শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তার শিক্ষা ও দর্শন তাঁর পূর্ববর্তী ও পার্শ্ববর্তী জাতীয়তার বিচ্ছিন্ন ও অনুন্নত প্রয়াসের তুলনায়

কাঞ্চনজঙ্ঘার মতই হঠাৎ অতি-উন্নতি ও অভিনব মহিমা লাভ করেছে।

জননী ও জন্মভূমিকে হয়তো কেউ কেউ স্বর্গাদপি গরীয়সী মনে করেছিলেন, কিন্তু একালে যাকে জাতীয়তা বা ন্যাশনালিজ্‌ম বলি তার চেতনা প্রাচীন বা মধ্যযুগের ভারতবর্ষে ছিল না। আধুনিক অর্থে ন্যাশনালিজমের জন্ম হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে নবজাগরণের (Renaissance in India) পরেই। এই ন্যাশনালিজমে শুধু স্বদেশকে ভালবাসার কথাই নেই, তার সঙ্গে আছে দেশকে একটি জীবন্ত সত্তা ও স্বতন্ত্র একক রূপে জ্ঞান করা এবং শেষে তার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা। এ চেতনা আধুনিক কালে গড়ে উঠেছে ক্রমে ক্রমে। ঊনিশ শতকের গোড়ার দিকে যুগসন্ধির কবি ঈশ্বর গুপ্ত শুনিয়েছিলেন –

কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।

কিন্তু এখানে স্বদেশের কুকুরকেও বিদেশের ঠাকুরের চেয়ে বেশি সম্মান দেবার মধ্যে যতখানি বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষ ছিল ততখানি স্বাদেশিকতার সঙ্গে সাংগঠনিক চেতনা ছিল না। তাঁর পরে নবযুগের প্রথম ইংরেজি শিক্ষিত কবি রঙ্গলাল শোনালেন যথার্থ দেশপ্রেমের ও জাতীয়তার প্রথম গান। তার আগে এ জিনিস ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে পাই না, কারণ ঈশ্বর গুপ্ত ইংরেজি শিক্ষা পান নি। অথচ জাতীয়তার চেতনা এদেশে ইংরেজি শিক্ষা সংস্কৃতির স্পর্শেই। ইংরেজের প্রতি এ ঋণ আমাদের রবীন্দ্রনাথের মতই অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করতে হয় –

"স্বাদেশিক ঐক্যের মাহাত্ম্য আমরা ইংরেজের কাছে শিখেছি। জেনেছি এর শক্তি, এর গৌরব। " – (বাংলা ভাষা পরিচয়)

নবজাগ্রত বঙ্গে রঙ্গলাল এ শিক্ষা পেয়েছিলেন বলেই আপনাদের শোনালেন

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব- শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায় ?" – (-পদ্মিনী উপাখ্যান)

-- দেশপ্রেমের সঙ্গে দেশের স্বাধীনতার স্পৃহা এখানে যুক্ত হল। স্বদেশের স্বাধীনতার মর্যাদাবোধই পরোক্ষে প্রতিধ্বনিত হল মধুসূদনের মেঘনাদের মুখে বিভীষণের প্রতি খেদোক্তিতে। এছাড়া দেশকে মাতৃরূপে ভাবনার যে নবচেতনা বঙ্কিম এনেছিলেন বলে মনে করি আমরা, তারও যেন বীজ পাই মধুসূদনের মধ্যে – "রেখ মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে!" প্রভৃতি উক্তিতে বঙ্গভূমিকে মাতৃরূপে সম্বোধনের সূচনা দেখতে পাই। মধুসূদনের অনুসরণকারী কবি হেম-নবীন অতীত ভারতের মহিমা কীর্ত্তনে জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনতে চাইলেন। হেমচন্দ্র একদিকে ভারতে জাতীয়তার চেতনা জাগরণে ইংরেজি শিক্ষার ঋণ স্বীকার করেছেন –

"ধন্য রে 'বৃটন' ধন্য শিক্ষা তোর,
যুগ-যুগান্তরের অমানিশি – ঘোর
তোরি গুণে আজ হল উন্মোচন
তোরি গুণে আজ – ভারত-ভুবন
এ সখ্য বন্ধনে বাঁধিল!" - (রাখি বন্ধন)

অন্যদিকে তেমনি অতীত ভারতের লুপ্ত গৌরবের জন্য হা হুতাশ করে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে তীব্রতর করতে চাইলেন –

"কোথা সে উজ্জ্বল হুতাশন সম
হিন্দু বীর দর্প, বুদ্ধি, পরাক্রম,
কাঁপিত যাহাতে স্থাবর-জঙ্গম,
গান্ধার অবধি জলধি সীমা ?
হয়েছে শ্মশান এ ভারত-ভূমি!
কারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি আমি?
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি !
আর কি ভারত সজীব আছে ?" – (ভারত-সঙ্গীত, কবিতাবলী)

কবি নবীনচন্দ্রের মধ্যে স্বাধীনতার জন্য হা-হুতাশের সঙ্গে মিলিত হয়েছে ইতিহাস সম্পর্কে দূরদৃষ্টি। পলাশীর প্রান্তর ছাড়িয়ে আরও অনেক দূরে চলে গেছে তাঁর দৃষ্টি – ভারতের স্বাধীনতা কি পলাশীর যুদ্ধে গেছে, না কি গেছে আরও অনেক আগে পানিপথের প্রান্তরে ? কবে আবার ফিরে পাব আমরা আমাদের আমাদের স্বাধীনতা-ধন ?

"পানিপথে যেই রবি গেলা অস্তাচলে,
ভারতে উদয় নাহি হইল আবার ;
পঞ্চশত বর্ষ পরে দূর নীলাচলে,
ঈষদে হাসিতেছিল কটাক্ষ তাহার।
কিন্তু পলাশীতে যেই নিবিড় নীরদ
করিল তিমিরাবৃত ভারত গগন,
অতিক্রমি পুনঃ সেই অনন্ত জলদ
হইবে কি সেই রবি উদিত কখন?" - (পলাশীর যুদ্ধ)

বাঙলায় কাব্যে-সাহিত্যে এমনি করে জাতীয়তাবাদের প্রস্তুতি রচিত হল। জাতীয়তার এক একটি দিক – স্বদেশপ্রেম, স্বাধীনতাস্পৃহা, স্বাধীনতার মর্যাদাবোধ, অতীত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ঐক্যবোধ – এসব এক-একজন কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে। অন্যদিকে সংস্কার ও সংগঠনের মাধ্যমে জাতীয় আত্মচেতনার সক্রিয় প্রকাশের সাধনা চলতে থাকে। রামমোহন হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করে উপনিষদ থেকে উদ্ধার করেন ভারত আত্মার আসল স্বরূপ, তাকে বিশ্বের তাবৎ ধর্মের সামনা সামনি তুলে ধরেন সমান মর্যাদায়। শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ ঋষি রাজনারায়ণ বসু স্থাপন করেন হিন্দুমেলা (১৮৬৫)। হিন্দু সংস্কৃতির চর্চার ও উপস্থাপনার এ হল এক উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। ক্রমে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব হল এবং বিবেকানন্দের পরে স্বদেশী ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জাতির পূর্ণ আস্থা ফিরে এলো। এমনি করে এক দিকে কবি সাহিত্যিকদের দ্বারা স্বদেশগাথা কীর্তন অন্যদিকে সংস্কারক ও আচার্য্যদের দ্বারা স্বদেশ আত্মার আবিষ্কার ও প্রকাশ – দ্বিবিধ প্রচেষ্টায় ঊনিশ শতক

থেকেই জাতীয় আত্মচেতনা রূপলাভ করতে থাকে। কিন্তু এই আত্মচেতনা আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামী হল বিশ শতকে শ্রীঅরবিন্দেরই শক্তি সাধনায়। ঊনিশ শতকের শেষের দিকেই অবশ্য জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল (১৮৮৫)। কিন্তু সে প্রতিষ্ঠার মধ্যে জাতীয়তার প্রথম দানা বাঁধার পরিচয়টুকুই রয়েছে। সেটি পুরোপুরি নিটোল রূপ নিলো এবং তার প্রথম বিস্ফোরণ ঘটলো শ্রীঅরবিন্দের হাতে ১৯০৭-০৮ সালে। জাতীয় আত্মার সংগঠন ও জাগরণের সঙ্গে তাকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করে সংহত সংগ্রামে উদ্দীপ্ত করে তোলা শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তার অন্যতম অভিনবত্বের চিহ্ন। এর আগে দেশকে মাতৃরূপে উপাসনার কথা বঙ্কিম শুনিয়েছিলেন 'আমার দুর্গোৎসব' ও 'আনন্দমঠে'। কিন্তু এই মা যে মহাশক্তির অধিকারিণী, তিনি সন্তানকে যে শক্তি দিয়ে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেন, বঙ্কিম সেই শক্তির শুধু চিত্ররূপ আমাদের দিয়েছিলেন, শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে জীবন্ত করে দেখালেন তার বাস্তব রূপায়ন।

কিন্তু এহ বাহ্য ! ভারতে জাতীয়তার ইতিহাসে শ্রীঅরবিন্দের এই অবদানের অভিনবত্ব আরও সবিস্তারে আবিষ্কার করবেন ঐতিহাসিকেরা। আমরা দেখতে চাই এর মধ্যে আরও এক গভীরতর গুরুত্ব, ব্যাপকতর তাৎপর্য । ভারতীয় জাতীয়তার জাগরণের পিছনে শুধু দেশপ্রেম বা রাজনৈতিক চেতনা বা স্বাধীনতা স্পৃহাই ছিলনা; এসব ছাড়াও এর পিছনে সক্রিয় ছিল আরও এক প্রচ্ছন্ন চেতনা, গভীরতর শক্তি। বিশ শতকের প্রথমার্ধে তো এশিয়ার আরও অনেক দেশেই জাতীয়তার জাগরণ হয়েছে, কিন্তু সে সব দেশে এই রকম কোনও প্রচ্ছন্ন চেতনা বা গভীরতর শক্তি আমরা পাই না। এ হল ভারতের অধ্যাত্ম সত্তার জাগরণের ও আত্মপ্রসারনের চেষ্টা এবং তার পিছনে ক্রিয়াশীল ভগবত-শক্তি। এ-যুগের আত্মঘাতী জড়সভ্যতার কাছে ভারতের পরাবিদ্যা তথা অমৃতবার্তাকে পৌঁছে দেবার একটি বিশ্বগত তাগিদ রয়েছে! পাশ্চাত্যে জড়শক্তির বিকাশ নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করে এসে রবীন্দ্রনাথ এ' তাগিদ উপলব্ধি করেছিলেন। ১৩২৮ বঙ্গাব্দে 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে তিনি লেখেন –

ভারতের কাছ থেকে এই অমৃতের বাণী শোনার জন্যে পশ্চিম দেশ কান পেতে আছে -

"পশ্চিমের যে শক্তিরূপ দেখে এলেম তাতে কি তৃপ্তি পেয়েছি ? না পাই নি। সেখানে ভোগের চেহারা দেখেছি, আনন্দের না। অনবচ্ছিন্ন সাত মাস আমেরিকায় ঐশ্বর্যের দানবপুরীতে ছিলেম। ... সেদিন সেই ভ্রূকুটি-কুটিল অভ্রভেদী ঐশ্বর্যের সামনে দাঁড়িয়ে ধনমানহীন ভারতের একটি সন্তান প্রতিদিন ধিক্কারের সঙ্গে বলেছে, অতঃ কিম? ... আমি শুনেছি পশ্চিম দেশ বারংবার জিজ্ঞাসা করছে, ভারতের বাণী কই? "

রবীন্দ্রনাথ আরও বুঝেছিলেন পশ্চিম যে বাণীর জন্যে ভারতের দিকে চেয়ে আছে সে বাণী ধ্বনিত হবে শ্রীঅরবিন্দের কণ্ঠেই ---

"আমি তাঁকে বলে এলুম, আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন এই অপেক্ষায় থাকব। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে - শৃন্বন্তু বিশ্বে।" (- 'প্রবাসী', শ্রাবণ, ১৩৫৫)

সেই শ্রীঅরবিন্দ উপলব্ধি করলেন ভারতের অমৃতবাণীকে বিশ্বের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে ভারতের স্বাধীনতার প্রয়োজন। সুতরাং ভারতের স্বাধীনতা শুধু ভারতের জন্যেই প্রয়োজন নয়, সমগ্র পৃথিবীর জন্যেই এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ভারত আত্মার আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতার একটি বিশ্বগত তাৎপর্য রয়েছে। ভারতীয় জাতীয়তার জাগরণের মধ্যে এতখানি বিশ্বগত তাৎপর্য আবিষ্কার, সেই অনুযায়ী তার পিছনে এতখানি শক্তিসঞ্চার এবং তার প্রকাশে এতখানি তেজঃস্ফূর্তি শ্রীঅরবিন্দের আগে বা সমকালে আর কেউ করতে পারেন নি। এবং সবচেয়ে বড় কথা, এই জাতীয়তার সংগ্রামী রূপের শিক্ষা যেমন তিনি দিয়েছিলেন – পূর্ণ স্বাধীনতার দীক্ষা যেমন তিনি দিয়েছিলেন, তেমনি যখন প্রয়োজন বোধ করেছেন তখন আবার তার গভীরতর তাৎপর্যের সন্ধানে অধ্যাত্মরূপের উদ্‌ঘাটনেও নিমগ্ন হয়েছিলেন। তাঁর সাধনায় এই অমৃতবাণীকে আত্মজীবনে তিনি মূর্ত করে তোলেন। ভারতীয়

জাতীয়তার জাগরণের গভীরতর তাৎপর্যের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের জীবনের এই গভীরতর সম্পর্কটিই ১৯৪৭-এর ১৫-ই আগষ্টের বাণীতে শ্রীঅরবিন্দ ব্যাখ্যা করেন।

কিন্তু ভারতের জাতীয় জাগরণের এই সুমহান তাৎপর্য থাকা সত্ত্বেও আজকে আমাদের দৃষ্টি কেমন খানিকটা মোহাচ্ছন্ন হয়েছে। সেই জাগরণের যুগের শক্তি, সেই ঐক্য যেমন আজ নেই, তেমনি সেই বেগ, সেই দৃষ্টিও নেই। আজকের মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি অতিমাত্রায় আত্মম্ভরী – তাই আজকের কণ্ঠে জাতীয়তার পুনর্বিচারের দাবী শোনা যায় প্রায়ই। সাম্প্রতিক কালে আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রচারে জাতীয়তাবাদের পুনর্মূল্যায়নের একটা ধুয়া কোন কোন মহলে শুনতে পাই। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে জাতীয়তাবাদের আসল মূল্য কি? আগামীদিনের সমাজ ব্যবস্থায় জাতীয়তাবাদের স্থান কি হবে? সেই প্রসঙ্গটি বিচার করেই জাতীয়তাবাদের জাগরণে শ্রীঅরবিন্দের অবদান সম্পর্কে আমাদের এই আলোচনা শেষ করব।

জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে আজকে যে অভিযোগ শুনতে পাই তার সদুত্তর খুঁজে পেলে আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার হবে। এই অভিযোগ মূলত দুটি। জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রথম ও প্রধান কারণ হল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাতীয়তাবাদের ভয়াবহ রূপ। জার্মানীর উগ্র জাতীয়তাই অনেকের মতে এই বিশ্বযুদ্ধে হিটলারী দুর্বুদ্ধির মৌল কারণ। মানুষের শুভবুদ্ধিকে নষ্ট করে সেদিন জাতীয়তাবাদ যে আক্রমণাত্মক ধ্বংসাত্মক রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল তাতে শিহরিত হল মানুষের আত্মা। রবীন্দ্রনাথ প্রধানত এই কারণেই জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছিলেন –

"... Power has become too abstract – it is a scientific product made in the political laboratory of the nation through the dissolution of personal humanity." -- (Nationalism)

দ্বিতীয়তঃ, এক শ্রেণীর পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিরা মনে করেন, জাতীয়তা হল কিছু সংখ্যক লোকের অর্থনৈতিক স্বার্থ সংগঠনের জন্যে একটা অজুহাত। তাঁদের মতে

জাতীয়তার মুখোশ পরে পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক দেশগুলি তাদের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যকে পাকা করছে। অনেকে মনে করছেন আগামী দিনের মানুষ পৃথিবী-জোড়া একটি সমাজ গড়ে তুলবে, তখন জাতি থাকবে না, জাতীয়তার নামে অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধিও থাকবে না।

কিন্তু জাতীয়তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত এসব অভিযোগ নিরাসক্ত দৃষ্টিতে বিচার করে দেখলে নিতান্তই অন্তঃসারশূন্য মনে হয়। প্রথমতঃ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূলে জাতীয়তাবাদের যে বীভৎস রূপ ধরা পড়েছিল তাতে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন বটে, কিন্তু তবু রবীন্দ্রনাথের কথা ছিল – জাতীয়তাবাদ থাকবে না, কিন্তু জাতি অবশ্যই থাকবে। কারণ, পৃথিবীর সমস্ত জাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে রাষ্ট্রের যান্ত্রিক শক্তি দিয়ে গুঁড়িয়ে দিলেই যে পৃথিবীতে মানব-ঐক্য স্থাপিত হবেই এমন কথা তো জোর করে বলতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের মতে একাকার হলেই এক হওয়া যায় না। ঐক্য রয়েছে বাইরের একাকারত্বে নয়, আত্মিক একত্বে। আবার কেন্দ্রীয় ঐক্যের উপলব্ধির উপরে ভিত্তি করে বিচিত্রের লীলাকে যদি যোগ্য স্থান করে দিতে না পারি, তা হলে সৃষ্টির তাৎপর্যই আমরা হারাব। তাই শ্রীঅরবিন্দ বললেন, পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতি তাদের বিচিত্র রূপেই সত্য এবং জাতীয়তা হল ভগবান থেকে আগত একটি ধর্ম।

একই কথা বলা যায় অর্থনৈতিক স্বার্থে জাতীয়তার অপব্যবহার সম্পর্কে। আজকের দিনে জাতীয়তার অপব্যবহার হওয়ার জন্যে যদি জাতীয়তার বিলোপ আমাদের কাম্য হয়, তবে তারও আগে আমাদের কামনা করা উচিত যন্ত্রশক্তি ও বিজ্ঞানেরই অবলুপ্তি! কারণ যন্ত্রের আবিষ্কার ও বিজ্ঞানের অবদানই পাশ্চাত্যে শিল্প-বিপ্লব ঘটিয়ে এক সময় ধনবাদের পরিপুষ্টিতে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করেছিল। দ্বিতীয়তঃ সভ্যতায় শোষণই বলি, অসাম্যই বলি, যুদ্ধই বলি বা সাম্প্রদায়িকতাই বলি – এসবের মৌল কারণটি তো বাইরে কোথাও নেই, রয়েছে মানবস্বভাবের মধ্যেই। সভ্যতার যে কোনও ব্যাধির চরম নিরাময়ের জন্যে মানব স্বভাবেরই আমূল

রূপান্তর প্রয়োজন। এই রূপান্তর শুধু রাষ্ট্রশক্তির শক্তি প্রয়োগ করে বা বাহ্যপরিবেশের পরিবর্তন সাধন করে হয় না।

জাতীয়তা বিশেষ বিশেষ মানবগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করে আত্মমুক্তি সাধনে সহায়তা করেছে এবং জাতীয়তার মধ্যে সৃষ্টির একটি মূল প্রেরণাই রূপ লাভ করেছে। মানুষের দুষ্টবুদ্ধি যদি এই মহতী শক্তির অপব্যবহার করে থাকে, তাকে যুদ্ধ বা শোষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকে, তবে জাতীয়তার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ অমূলক। শ্রীঅরবিন্দ আমাদের কালের একটি ব্যাপক ভ্রান্তির নিরসন করে বললেন –

It may be said that the last result of something done – the war, the collapse, the fierce reaction towards the rigid, armoured, aggressive, formidable Nazi state – is not only discouraging enough, but a clear warning to abandon that path and go back to the older and safer ways. But the misuse of great powers is no argument against their right use. (- The Human Cycle, p-48).

শ্রীঅরবিন্দ তাই একাধারে জাতীয়তার জনক এবং জাতীয়তার রক্ষাকর্তা।

*** শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সৌজন্যে

"যে মানুষটা বলে, আমার শেখবার নেই, সে মরতে বসেছে। যে জাতটা বলে আমরা সবজান্তা, সে জাতের অবনতির দিন নিকটে! 'যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি।' তবে দেখ, জিনিসটে আমাদের ঢঙে ফেলে নিতে হবে, এইমাত্র। আর আসলটা সর্বদা বাঁচিয়ে বাকী জিনিস শিখতে হবে।"

-- **স্বামী বিবেকানন্দ**

কোহিমায় ক' জনায় **অরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য**

ন' দিনে তিন রাজ্যকে বুড়ি ছোঁয়া করে ঘুরিয়ে দেখানোর ব্যবস্থা হয়তো অনেক ভ্রমণ সংস্থাই করে দেয়, সুতরাং সে নিয়ে বড় মুখ করে বলার কিছু নেই, কিন্তু একদিনে তিন রাজ্যের রাজধানীতে পা রাখার অভিজ্ঞতা, তাও আবার এক ভ্রমণে দুই দুই বার ! এ কেবল এক্সপ্লোরার গ্রুপের পক্ষেই সম্ভব। এমনিতেই NMT অথাৎ নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, ত্রিপুরা ভ্রমণ পরিকল্পনা খুব সহজ সাধ্য ছিলনা, কারণ মিজোরাম আর নাগাল্যান্ডের ইনার লাইন পারমিট (ILP) । মিজোরামের ক্ষেত্রে পারমিট আগে না করা থাকলেও তেমন সমস্যা হয়না। আইজলের এয়ার পোর্ট LENGPUI-তে ৩৫০ টাকা দিয়ে দু'মিনিটে পারমিট বার করে নেওয়া যায়। নাগাল্যান্ডের পারমিট পেতে কিন্তু সমস্যা আছে। সবচেয়ে বড় ঝামেলা যে মোবাইল থেকে অ্যাপ্লিকেশন করা হচ্ছে, অন-লাইনে ওপেন ফটো তুলে পাঠাতে হবে সেই মোবাইল থেকেই। আমাদের গ্রুপের এক্সপার্ট গৌতম চ্যাটার্জি থাকায় অনেকেই অবশ্য তার মোবাইলের কৃপায় পার পেয়ে গেছে, না হলে স্বয়ং ভোলে বাবার (আমাদের টিম ম্যানেজার শিবনাথ) শরণ নেওয়া ছাড়া গতি ছিল না। যাইহোক, ওই যে দু'বার তিন রাজ্যের রাজধানীর কথা বলছিলাম না? তার মধ্যে একবার আইজল থেকে কলকাতা ছুঁয়ে আগরতলা, আর অন্যবার আগরতলা থেকে কলকাতায় প্লেন বদল করে নাগাল্যান্ডের এয়ারপোর্ট ডিমাপুর হয়ে কোহিমায় পৌঁছে যাওয়া। আজকের গল্প অবশ্য শুধু নাগাল্যান্ডের রাজধানী কোহিমাকে কেন্দ্র করেই।

গল্পের শুরুটা হয়েছিল নভেম্বরের পাঁচ তারিখে, যে দিন এক্সপ্লোরার গ্রুপের শিবনাথ ঘোষের সাথে আমরা কুড়ি জনের একটা দল আইজলের প্লেনে উড়েছিলাম। তারপর মিজোরামের আইজল আর ত্রিপুরায় ঊনকোটি সমেত আগরতলা দেখার পর নাগাল্যান্ডে ল্যান্ড করার পালা। আগরতলা থেকে যদি সরাসরি কোহিমার ফ্লাইট থাকতো তা হলে তো কথাই ছিলো না। পরিতাপের বিষয় কোহিমায় কোন এয়ারপোর্টই নেই। নাগাল্যান্ডের একমাত্র এয়ারপোর্ট ডিমাপুরেও এক উড়ানে

আগরতলা থেকে পৌঁছাবার উপায় নেই। বিকল্প যে সড়ক পথ, আসামের শিলচর অথবা মণিপুর রাজ্য ছুঁয়ে সেই ৬১২ কিলোমিটার পার হতে অন্তত ১৮ ঘন্টার ভোগান্তি। কাজে কাজেই নভেম্বরের দশ তারিখে কলকাতা হয়ে ডিমাপুর পৌঁছানো ছাড়া আমাদের উপায় ছিলনা। কপালটাও খারাপ বলতে হবে, কারণ দিনের যতটা সময় আকাশে উড়েছি, ইন্ডিগোর খামখেয়ালিপনায় তার চেয়ে অনেক বেশি সময় কাটাতে হয়েছে আগরতলা আর কলকাতার বিমান বন্দরে। তারপরেও হয়তো ডিমাপুর থেকে কোহিমার ৭৪ কিলোমিটার পথ সওয়া দু ঘন্টায় পেরিয়ে সূর্যাস্তের আগেই কোহিমা পৌঁছে যাওয়া যেতো, কিন্তু শেষ দিকটায় রাস্তা মেরামতির কারণে অচেনা ঘুর পথে ঘুরে মরে যখন কোহিমায় আমাদের হোটেল BLUE BAYOU-র দরজায় পৌঁছালাম, ততক্ষণে সূর্য ডুবে গেছিল নাগা পাহাড়ের পিছনে।

অরুণাচলকে বাদ দিলে ভারতের পূর্বতম পাহাড়ি রাজ্য এই নাগাল্যান্ড। সেখানকার রাজধানী কোহিমায় পৌঁছবার আগেই অন্ধকার ঘনিয়ে এলেও দিনটা যে পুরোপুরি বৃথা গেছে এ কথা বলা যাবেনা। প্রথমত ডিমাপুর থেকে কোহিমার পথে ৪৭৬ ফুট উচ্চতার প্রায় সমতল শহর কেমন করে পাহাড়ি প্রকৃতিতে হারিয়ে যায় সে দৃশ্য- তারপর 'ওয়েলকাম টু হিলস নাগাল্যান্ড' দেখতে দেখতে সবুজের ডাকে সাড়া দেওয়ার আনন্দ – সর্বোপরি অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর দূর থেকে আলোকোজ্বল কোহিমার ঝিকিমিকি - এক কথায় অপূর্ব। NH 29 এর মাঝখানে চেকপোস্ট ছিল বটে, তবে চেক করার জন্য কোন লোক ছিলনা। প্রসঙ্গতঃ ১০ থেকে ১৩ই নভেম্বরে কোহিমা থাকাকালীন পারমিটকে কখনও প্লাসটিকের ফোল্ডার ছেড়ে বাইরে আসতে হয়নি, এমনকি ডিমাপুর এয়ারপোর্ট থেকে বাইরে আসার সময়ও নয়।

অনেক পাহাড়ি শহরে যেমনটা হয়, কোহিমার BLUE BAYOU হোটেলেও কোন লিফ্ট ছিলনা। সিঁড়ি ভেঙে আমাদের দোতলায় অথবা তিনতলায় উঠতে হয়েছে বটে, কিন্তু বিশাল সাইজের ঘরগুলো ছিল সত্যিই একেবারে একঘর। রিসেপশন

আর ডাইনিং হল রাস্তার সমতলে হওয়ায়, একতলার কাপল'রা তো বটেই, বাকি সকলেও ডিনারের অনেক আগে সেখানে হাজির হয়ে যেত চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলতে। বিশেষ করে বলতে হবে ১২ তারিখের সান্ধ্য আসরের কথা। এবারকার ভ্রমণের শেষ রাত্রি হওয়ায় গৌতম চৌধুরীর প্রযোজনায় যে কফি ক্যাফে বসেছিল, তাতে অন্য অনেকের আনা স্ন্যাকস এমন কি কফিটাও ছিল গৌণ, আসলে নাচে গানে গল্পে সকলে এমনই মেতে উঠেছিল মনে হয়েছিল 'এ শুধু গানের দিন' আর আভাসের গানে যখন সিনিয়র সিটিজেনদের কোমর দুলে উঠলো তখন তো কেমন মজ্জাই মজ্জা।

১১ তারিখের সকালে ব্রেকফাস্টের পর 'খোনোমা' গ্রাম দিয়ে ভ্রমণের শুরু হওয়ার কথা থাকলেও আমার দেখা শুরু হয়ে গেছিল ব্রেকফাস্টের অনেক আগে। হোটেলের ছাদ থেকে কোহিমার ভিউ যেমন সুন্দর, তেমনি সুন্দর নাগা পাহাড়ের পিছন থেকে সূর্যদেবের আত্মপ্রকাশ। হোটেলের ডানদিকে মিডল্যান্ডে রয়েছে KOHIMA AO BAPTIST CHURCH । সবকিছুকে ক্যামেরা বন্দী করে পায়ে পায়ে উঠে আমি হোটেলের ঠিক উল্টোদিকে KOHIMA WAR CEMETERY-র একদম উপরে। শহরের প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত এই সিমেট্রিতে প্রবেশ করলেই প্রথমে মনে পড়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র আর তাঁর বীর জওয়ানদের কথা। তিন মাসের যুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তিকে পরাজিত করে স্বাধীন ভারতের পতাকা তোলা হয়েছিল ১৯৪৪ সালের এপ্রিলে। খারাপ লাগে যখন দেখি ইতিহাস আজ বিকৃত হয়ে প্রদর্শিত হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়ী ইংরেজদের কারসাজিতে। ধাপে ধাপে শায়িত রয়েছে নিহত ব্রিটিশ সৈনিক। আমার ভাগ্য ভালো যে দিনটা ছিল ১১ই নভেম্বর। ১৯৪৫ সালের এই দিনটি আজও যুদ্ধবিরতি দিবস হিসেবে পালিত হয়ে চলেছে। তাই আসাম রাইফেলস সেনাদের প্যারেড আর পতাকা উত্তোলন একটি রুটিন ঘটনা হলেও আমার অতীতচারী মানসচক্ষে নেতাজি যেন সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

খোনোমা ভিলেজ আমাদের হোটেল থেকে প্রায় ১৮ কিলোমিটার।

দলেবলে যখন সবাই সেখানে পৌঁছালাম, ঘড়ির কাঁটা তখনও ১১টাকে ছুঁতে পারেনি। ভিলেজের প্রবেশ পথের পাশেই জনপ্রতি ৫০ টাকা নেওয়ার কাউন্টার, আদায় করে ইকোট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট কমিটির অফিস। তাছাড়া কমিটির নির্ধারিত গাইড ছাড়া ভিলেজ দেখার অনুমতি মেলেনা। গাইড ফি বাবদ ২০ জনের দলটাকে দিতে হয়েছিল আরও ৫০০ টাকা। প্রসঙ্গত বলে রাখি, নাগাল্যান্ডের যে কোন ভিলেজ দেখতে হবে পায়ে হেঁটে, তাই পায়ে জোর চাই। তবে খোনোমার মত সব জায়গাতেই যে এন্ট্রি ফি আর গাইড ইজ্ মাস্ট- তেমনটা কিন্তু নয়। ৫৩১৮ ফুট উচ্চতার ৪২৪ ঘরে ১৯৪৩ লোকসংখ্যা নিয়ে যে গ্রামে আঙ্গামি নাগারা ৭০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাস করছে, তা বিশেষভাবে পরিচিতি পেয়েছে মাত্রই ২০০৫ সালে যখন একে এশিয়ার প্রথম সবুজ গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে ঘরে ঘরে হাতে বোনা যন্ত্রে উলের মাফলার সোয়েটার ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে, রয়েছে বিক্রীর জন্য দোকানও। আর রয়েছে ট্র্যাডিশনাল সব কুটীর, যার দরজায় অথবা ভিতরে রয়েছে মাউন্ট করা বিভিন্ন প্রাণীর শিং। একসময় যে নরমুণ্ডও থাকতো তার প্রমাণ পরে মিউজিয়মে দেখেছি, তবে শিকারের সংখ্যা দিয়ে যে বীরত্ব বোঝানো হতো এটা নিশ্চিত। আফ্রিকার মাসাইদের সাথে খানিকটা মিল থাকলেও এইরকম গ্রামের সাদৃশ্য ভারতে আর কোথাও খুঁজে পাইনি। খোনোমার আরেক আকর্ষণ এখানকার একাধিক ভাঙ্গাচোরা দুর্গ। গাইড বলে না দিলে অবশ্য দুর্গ বলে চেনার উপায় নেই, যদিও এই SEMONA ফোর্টের দৌলতেই নাগা সৈন্যরা ১৮৫০ থেকে ১৮৭৯ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেছে। ফোর্টের প্রথম অংশের মাথায় সহজে উঠে যাওয়া গেলেও দ্বিতীয়টার মাথায় চড়তে দম লাগে। তবে উঠে আসার পর এক নজরে খোনোমা কে ক্যামেরাবন্দী করার পর মনে হবে সার্থক এই পরিশ্রম।

খোনোমার পরে আমাদের গন্তব্য আরো কুড়ি কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমের মনোমোহিনী গ্রাম DZULEKE. এখানকার পিকনিক স্পটে যেতে পারমিট লাগে নিশ্চিত, কিন্তু পারমিশন দেবার জন্য অফিসে কেউ থাকলে তো ! বার তিনেক হর্ন

বাজিয়ে আমাদের দুটো গাড়ি পিকনিক স্পটে পৌঁছাতেই বুঝলাম জুলেককে প্রকৃতি আন্তরিক অর্থেই সাজিয়েছে তার মনের মত করে। বায়ো ডাইভারসিটি অথবা ইকো ট্যুরিজমের কথা যদি নাও ভাবি, জঙ্গলের সাথে লুকোচুরি খেলতে খেলতে বয়ে যাওয়া নদীর ধারে এসে দাঁড়ালেই মন ভরে যায়। নভেম্বরের মাঝামাঝি জুলেক ঘুম পাড়ানি গান শোনালেও ভরা বর্ষায় সে যে নাগা বীরাঙ্গনার রূপ দেখাবে তা নিশ্চিত। জুলেক নদীকে নীচে রেখে পিকনিক স্পটের শ্যামল প্রান্তরে এসে দাঁড়ালে শমন যেন দৌড়ে পালায়! মাঠের শেষে কালো পাহাড়, তার ওপর নীল আকাশের গায়ে সাদা মেঘের ভেলা। আধুনিক সুবিধা না থাকলেও মনে হয় এখানকার কাঠের ঘরে একটা রাত কাটিয়ে যাই।

৪৭৩৮ ফুট উচ্চতায় মাত্র ২০ বর্গ কিলোমিটারের কোহিমায় ডাকবাংলোকে পাশে রেখে সামান্য যেতেই কোহিমা বাজার। পথের দুপাশে একতলা কাঠের বাড়িগুলি অতি সাধারন, তবে আধুনিক ইমারতও এখন মাথা তুলছে এর ফাঁকে ফাঁকে। নাগা, বাঙালি, পাঞ্জাবী আর মণিপুরীরা পসরা সাজিয়ে বসেছে। জাতীয় পোষাক পরা নাগা দোকানীরা যে নেই তা নয়, তবে সংখ্যায় নগণ্য। সাপ, ব্যাঙ, বাঁদর, কুকুর – সবেরই মাংস বিক্রী হচ্ছে এখানে। তবে চিকেন মাটনের তুলনায় কুকুরের মাংসের দাম বেশি। রাইস বিয়ার এদের প্রিয় পানীয় আর প্রিয় খাদ্য বাঁশের কোঁড় এবং মাশরুম। ভিক্ষাবৃত্তি এই বীরজাতের স্বভাববিরুদ্ধ। নাগা সংস্কৃতি বুঝতে ১২ তারিখের দুপুরে ঢুঁ মেরেছিলাম শহর থেকে দেড় কিলোমিটার উত্তরে স্টেট মিউজিয়ামে। বাংলার কৃষ্ণনগরের শিল্পীদের অনবদ্য মডেলে সংস্কৃতির সাথে উপকথা, ইতিহাস ও সমাজ জীবন দেখতে পাওয়া যায় সোম থেকে শুক্র - সকাল দশটা থেকে দুপুর তিনটায়। চ্যাং কারেঙ্গির মুদ্রাও প্রদর্শিত হয়েছে মিউজিয়মে যার সালতামামি আজও জানা যায়নি। ১২'র সকালটা অবশ্য শুরু হয়েছিল শহরের আউটস্কার্টে অবস্থিত KISAMA হেরিটেজ ভিলেজ থেকে। এই গ্রামে ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে অর্থাৎ আমাদের ভ্রমণের অল্প কিছুদিন পরেই অনুষ্ঠিত হবার কথা

দশ দিন ব্যাপী হর্নবিল ফেস্টিভ্যাল, যা নাগাল্যান্ডের বৃহত্তম সাংস্কৃতিক উৎসব। দেশ বিদেশের ট্যুরিস্টদের সমাগম হয় ঐতিহ্যবাহী এই উৎসবে।

রিনোভেশন চলছে বলে কিসামা গ্রামে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনা সম্বলিত মিউজিয়ামে ঢুকতে না পারলেও ছোট ছোট কুটীরে KUKI, REHANGKI, ANGAMI উপজাতি গ্রামের মডেল দেখে মন ভরে গেছে। কিসামা গ্রামে রয়েছে ছোট্ট একটি চার্চ ও। তবে যে চার্চ আমাদের মন মজিয়েছে তাহলো ৪৫০০ লোকের প্রার্থনা গৃহ সম্বলিত ক্যাথেড্রাল অফ কোহিমা। দূর থেকেই বুঝেছিলাম - অসাধারণ, তারপর গাড়ি যখন চার্চের প্রাঙ্গনে নামিয়ে দিল তখন চার্চ না তার ভিউ পয়েন্ট থেকে একনজরে কোহিমা, কোনটা ছেড়ে কোনটা আগে দেখি ভাবনায় একেবারে সসেমিরা অবস্থা। CATHEDRAL OF MARY HELP OF CHRISTIANS নামের চার্চকে ঘিরে প্রাঙ্গন জুড়ে ট্রাডিশনাল নাগা হাউসের আদলে তৈরী কাঁচের শো-কেস গুলোয় যে ভাবে যীশুর জীবনের বিভিন্ন অধ্যায় প্রদর্শিত হয়েছে তাতে মন গলগোথা – জেরুজালেমে পৌঁছে যেতেই পারে। বাস্তবে ফিরি কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙে মা মেরীকে পাশে রেখে চার্চের উপর অংশে উঠে এসে । প্রার্থনা গৃহ তখন বন্ধ ছিল। তাতে কি? এখান থেকে শহর কোহিমার যে অসাধারণ দৃশ্য- এটাই বোধহয় কোহিমা ট্যুরে সেরা প্রাপ্তি।

পাখির চোখে কোহিমা

গ্রামের নাম খোনোমা

ফোর্ট খোনোমা

ক্যাথেড্রাল চার্চ, কোহিমা

কোহিমা ওয়ার সিমেট্রি (চিত্রে লেখক)

কিসামা গ্রাম

কিসামা চার্চ

কিসামার ভাস্কর্য

মাতৃপূজা

শান্তশীল দাস

দুঃখ ব্যথার অঞ্জলিতে
মা তোর পূজা করবো এবার,
ভাণ্ডারে যে নেইকো কিছুই
ওই চরণে অর্ঘ্য দেবার।

রাঙ্গিয়ে নিয়ে হৃদয় কমল
ব্যথার রঙে, সেই শতদল
দেব মা তোর চরণ তলে
এর বেশি যে নেই কিছু আর।

আড়ম্বরের নয় এ পূজা'
বাহিরে তার নাই আয়োজন,
অন্তরেতে প্রদীপ জ্বেলে
চোখের জলে মাল্য রচন।

নিস্ মা তুলে সেই পূজা মোর,
দিস্ বরাভয় আশীসটি তোর;
সকল চাওয়া সেই বরে মা
পূর্ণ হবে আমার পাওয়ার।

প্রয়োজন নেই

বাণীপ্রভা

জন্মের পরে শৈশব কৈশোর যৌবনের মতোই
একটা অবস্থা এই বৃদ্ধাবস্থা।
জীবনের সেই যৌবনের দিনগুলো
হাওয়ার পিঠে চেপে কাটিয়ে দেয়,
চলতে পথে সামনে কোন বৃদ্ধকে দেখলে
"এই হট্ বুড়ো" বোলে তাকে অবহেলা করে,
তখন মনে পড়ে না তারও জীবনে
একদিন এমনি অবস্থা আসবে।
বুড়ো তো সরে যায়, কিন্তু রেখে যায়
তার শরীরের অক্ষমতার অভিশাপ।
হাওয়ার গাড়ীতে চলতে চলতে একদিন
চাকা যায় ধ্বসে, একটু আগেও
যা ছিল হাতের মুঠোয় এখন তা
চোখের সামনেও ধরা পড়ে না।
সবাই যে জীবনে ভুল করে তা' নয়,
যে করেনি তারও ঝুলি ফাঁকা।
এই অবস্থায় এলে সবার সঙ্গে
সমব্যবহার করা হয়, এটাই সংসারের নিয়ম।
উচ্চ নীচ, ভালো মন্দ, সৎ অসৎ কোন ভেদাভেদ নেই –
আমরা সবাই এক, আমরা বৃদ্ধ,
আমরা যা পেরেছি দিয়ে এসেছি,
কিন্তু চাইবার কোনও অধিকার নেই,
কারণ আমাদের আর কোনও প্রয়োজন নেই।

ফিরে চাওয়া

সুনন্দন ঘোষ

স্কুল থেকে ইউনিভার্সিটি, সেখান থেকে রোজগারের লড়াই .....
জেলা থেকে জেলায় .....
কোথাও তখন লালের তাণ্ডব, কোথাও সবুজের,
শরীর মনের দ্বন্দ্ব চলেছে দশক থেকে দশক।
কালের নৌকো বয়ে চলে আলোয় আঁধারে --
মন মানে না, সময় মানিয়ে নেয়!।

শরীরে এখন মহাকালের আলিঙ্গন,
স্থবিরতা দু' পায়ে,
ইচ্ছে তবু মাথা খোঁড়ে নতুন উপত্যকায় পথ চেনার।
গাছের কাণ্ডের মত নুয়ে পড়ছে দেহ,
বেড়ে চলেছে দায়িত্বের ভার।
বেড়ে চলেছে শরীরের ঋণ শোধ করে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা।

ফেসবুক, মেসেজ, পুরনো ডায়েরী .....
ফিরিয়ে নিয়ে যায় গ্লেসিয়ারের ঢালে হলুদ তাঁবুতে
গরম চায়ের ধোঁয়ায়।
অনেক মুখের অবভাস - মিলে মিশে একটাই মুখ,
অনেক কথা, কিছু অভিমান,
সফেন ভালোবাসার কবিতা।